Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 117 – 124
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : নারীর জীবন-জটিলতার স্বরূপ

সুমাইয়া আফরীন সানি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : sumaiasunnyju36ban@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Jibananda Das, Short-story, Female Character, Complexity of life.

Abstract
Jibanananda Das holds great significance in the realm of contemporary Bengali literature. Although he is well-known among readers as a poet, but his contribution to the field of fiction is undeniable. He has vast collection of short stories, which feature a variety of female characters. One notable thematic element observed in Jibanananda 's short stories pertains to the depiction of women's experiences from various societal, familial, and individual perspectives. The author's stories also incorporate artistic representations of adverse occurrences in his personal life. He himself never found women to be a symbol of tenderness. Persistent doubt, cynicism, and avoidance perpetually afflicted his personal existence. However, he possessed a profound inclination for the beauty and empathy exhibited by women. Hence, the writer's profound longing to attain the affection of women is reflected in his narratives. Jibanananda presents a distinct portrayal of women in his short stories, deviating from the conventional perception of women in Indian society. Therefore, the hardness and lovelessness of their hearts are more visible in the short stories than their natural tenderness. This article explores the impact of the challenges, disruptions, and hardships experienced by women on the psychological well-being of their husbands within the framework of marital relationships. The characterization of female characters in his narratives was also influenced by the socio-economic context of that time. Due to unemployment, the educated, sensitive male characters in his stories must live a life of extreme humiliation. And naturally, his heat has come on the female character associated with the hero. Furthermore, Jibanananda Das's short stories depict a situation where the daughter-in-law's life is put at risk because of the mother-in-law's negative behaviors. The female characters in his short-stories have encountered numerous obstacles because of the anguish associated with shattered dreams related to marriage, the subjugation of women within patriarchal systems, and society's limited perception of women. The female character in Jibanananda's short story experiences a sense of misery and solitude because of the prevailing feelings of despair and melancholy in contemporary society. Consequently, the female characters within his narratives have

a tendency towards self-absorption, disregarding societal norms and expectations. The objective of this essay is to examine the contextual factors and inherent intricacy of the lives of the female characters portrayed in the author's narratives.

Discussion

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন তখন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক জীবনে ছিল চরম ভঙ্গুরদশা। তাঁর গল্পের পরতে-পরতে সে দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। তিরিশের দশকের শুরুর দিকে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব মধ্যবিত্তের জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এনেছে তারই নির্মম শিকার হয়েছে তাঁর গল্পের নারীচরিত্রসমূহ। জীবনানন্দ দাশ নিজেও নিশ্চিত জীবিকার অভাবে ব্যক্তিগত জীবনে ভয়াবহ নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। স্ত্রী লাবণ্য দাশের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্বের কথা অনেকটাই সর্বজনবিদিত। এসব আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। স্ত্রী-চরিত্রের বিরূপতা, প্রেমহীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্রকে তিনি নিরাভরণরূপে উপস্থাপন করেছেন। স্বার্থপর সময়ের প্রভাবে নারীর সর্বান্তকরণে যে স্বার্থান্ধতা ও বিযুক্তিবোধের জন্ম হয়েছে তার প্রতিফলন লক্ষণীয় এসব গল্পে। নারী তার দায়িত্ব, কর্তব্য, মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা ভুলে নারী কতোটা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠতে পারে তার চিত্র সর্বপ্রথম জীবনানন্দ দাশই দেখিয়েছেন। পীড়নকারী চরিত্রের পাশাপাশি নিপীড়িত ও অন্তর্জগতের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত নারীর সংখ্যাও কম নয় তাঁর গল্পে। কখনও কখনও তারা নীরবে অপমান সহ্য করেছে, আবার কখনও অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেছে। বস্তুত মানসিক অবসাদ, কুটিল মানসিকতা, হিংসা, স্বার্থান্ধতা, আশাভঙ্গের বেদনা, হতাশা ও বিপন্নতা জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পের নারী চরিত্রসমূহের জীবনকে জটিলতর করে তুলেছে।

আবহমান কাল ধরে বাংলার সমাজে নারীজাতি বিভিন্নভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছে, কখনও পুরুষের দ্বারা আবার কখনো নারীর দ্বারাই। গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে শুরু করে শহুরে উচ্চবিত্তের জীবনে একই ধরনের বাস্তবতা দেখা যায়।

> "বিয়ের আগে মেয়েরা সুখবহ দাম্পত্য জীবনের জন্য অপেক্ষা, প্রস্তুতি ও শঙ্কা নিয়ে দিন কাটায়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নভঙ্গের গতানুগতিক চিত্র দেখা যায় তাদের জীবনে।"[১]

'মা হবার কোনো সাধ' গল্পের শেফালী চরিত্রটি অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যেমন স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্য উপভোগের সুযোগ পায়নি, তেমনি মাতৃত্বকেও সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে পারে না। বিয়ের পূর্বে প্রমথের যদিও উপার্জনের কিছুটা ব্যবস্থা ছিল কিন্তু বিয়ের পর থেকে সে একেবারেই কর্মহীন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এর দায় বর্তায় স্ত্রী শেফালীর ওপর। এখানে পুরুষতন্ত্রের ধারক তার শাশুড়ি তথা অন্য একজন নারী।

> "রোজই ঘুমের থেকে উঠে বউয়ের ভাগ্যে ধন, ধন না শন? এার ঝ্যাঁটা মার ঝ্যাঁটা বলে ঝ্যাঁটা হাতে করে তিনি বাড়ির কাজকর্মে বেরিয়ে যান।"[২]

সে সন্তান-সম্ভাবা জেনেও পরিবারের লোকজন কেউ তার দিকে মমতার হাত বাড়ায় না। গরুর বাছুর হলেও যেখানে সবার আনন্দ ধরে না সেখানে তার বেলাতেই কেন এমন অনিয়ম হতে যাবে তা সে বুঝতে পারে না। শুরুতে সে স্বামীর প্রতি বিরূপ ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে স্বামীর কাছেই তার মানসিক যন্ত্রণার কথা জানিয়ে নির্ভার হতে চায়। পুরুষতন্ত্রের নির্মম কশাঘাতে পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও সে পুত্রসন্তানের প্রত্যাশা করে। তার মনের ভেতর ধারণা জন্মে যে পুত্রের ভাগ্যে একসময় তারও সুদিন আসবে, স্বামীর একটা ভালো চাকরি হবে। স্বামী পুত্র নিয়ে তখন সে সুখে সংসার করতে পারবে। শেফালীর এই মনোবাসনা অধিকাংশ বাঙালি নারীরই চিরন্তন আকুতি। তবে তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আশা পূরণের পূর্বেই যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে তাকে জীবন থেকে বিদায় নিতে হয়।

'রক্তমাংসহীন' গল্পটি নারীর অসহায়ত্ব ও বেদনার রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবি বহন করে। বেকার ও দরিদ্র স্বামীর মানসিক বিযুক্তি ও বিচ্ছিন্নতার কারলে ঊষার জীবন হয়ে ওঠেছে অর্থহীন ও কুয়াশাচ্ছন্ন। স্বামীর সংসার থেকে ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেও সে মন থেকে কোনও সাড়া পায় না। এ ব্যাপারে স্বামীর নিস্পৃহতায় সে আরও বিষন্ন হয়। দোলাচল অতিক্রম করে একসময় সে স্টিমারে ওঠে কিন্তু তখনও তার জীবনসঙ্গী ছিল নির্বিকার। অন্তত বিদায়-মুহূর্তে ঊষা তার স্বামীর কাছে কিছুটা মমতা প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু এ সৌভাগ্য তার হয়ে ওঠে না। দিন-দশেক পরে যখন স্বামী জানতে পারে যে কলেরায় তার মৃত্যু হয়েছে তখন তাকে নেহায়েত সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে সে। এরূপ মূল্যহীনতা ও অসহায়ত্ব বাঙালি নারীর জীবনের একটি পরিচিত চিত্র।

জীবনানন্দের অধিকাংশ গল্পে আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার কারণে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মানসিক বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাত্ত্¡কগণ বিচ্ছিন্নতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতেও অর্থনৈতিক বিষয়টিই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন -

> "Alienation is a social-psychological condition of the individual which involves his estrangement from certain aspects of his social existence."[৩]

'চাকরি নেই' গল্পে শিক্ষিত বেকার স্বামীর আর্থিক দীনতায় স্ত্রীর মনে বিযুক্তিবোধ জন্মেছে। তাই স্বামীর প্রতি সে মমতাহীন হয়ে ওঠে। সুকুমার বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার ঘরের চেহারা বদলে গিয়েছে। তার নিজের জন্য বরাদ্দকৃত আলাদা কোঠার অস্তিত্ব বিলীন, পড়ার বইগুলোও স্বস্থানে নেই। এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে শোওয়ার অধিকারও সে হারিয়েছে। গভীর রাতে ঘুমাতে এসে নির্মলা তাকে বিছানায় দেখতে পেয়ে অপ্রসন্ন হয়ে প্রশ্ন করে -

> "তুমি এই বিছানায় কেন?"[৪]

কেননা সুকুমারের অবর্তমানে সে তাদের দু'জনের শোবার জায়গা বেড়া দিয়ে পৃথক করে রেখেছে। বিষন্ন হয়ে সুকুমার ওঠে গেলেও সে তাকে ফিরে ডাকার প্রয়োজন বোধ করে না। লণ্ঠনের আলোতে নির্মলার ঘুমাতে অসুবিধা হবে বলে সুকুমারকে পড়াশোনা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে রাখতে হয়। শুধু তাই নয় নির্মলা ঘুমানোর আগ পর্যন্ত তাকে জেগে থাকতে হয়, কেননা -

> "সুকুমার জেগে থাকলেই সে ঘুমুতে পারে। এইটুকু মাত্র ভরসা স্বামীর কাছ থেকে সে চায়। সুকুমারকে নিজের খাটের পাশে এনে বসাবার কোনো প্রয়োজন নেই নির্মলার। রোজ রাতেই কয়েকবার স্বামীকে সে ডাকে। স্বামী তার খাটে জেগে কিনা? পাহারাওয়ালা অন্ধকারে ধাঁধা খেয়ে যেমন ডাকে তেমনই একটি ভীতি বিহ্বলতার সঙ্গে।"[৫]

বস্তুত স্বামীর প্রতিই নির্মলা ভরসা করতে চায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার পরও সুকুমার যখন জীবন ধারণের উপযোগী চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে না তখন তার বিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগে।

ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া গল্পেও স্বামীর অর্থনৈতিক অসফলতা ও বেকারত্বের কারণে আশাহত, ক্ষুব্ধ স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাজ সারাদিন লেখাপড়া করলেও কমলা তার লেখালেখির ব্যাপারে কোনও আগ্রহ অনুভব করে না। এভাবেই বিরাজের সঙ্গে তার বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়। নিজস্ব উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকায় বিরাজকে পরিবারের ওপর নির্ভর করতে হয় যা কমলা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। মানসিক দূরত্বের কারণে স্বামীর লেখালেখির জন্য নিরিবিলি পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে অপারগ হয় সে। শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ কমলার পক্ষে এতোটাই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে, সে লেখাপড়াকে পুঁজি করে বাড়ি ছেড়ে মুক্তি পেতে চায়। কমলার ঢাকা ইডেন কলেজে পড়ার ইচ্ছে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে স্মরণ করায়। কেননা তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশও ঢাকা ইডেন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। গল্পে মুক্তির জন্য কমলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্তরূপে -

> "ইডেনে থেকে কমলা কিছুদিন আই এ পড়েছিল, আবার সে ইডেনে চলে যেতে চায়। পড়বার জন্য নয়, কিন্তু এই পরিবারের থেকে, এই বিবাহিত জীবনের থেকে খালাশ পাবার জন্য, কমলা জানে ইডেনে হলে খুকিকেও ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু খুকিও আজ তার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"[৬]

জাগতিক অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তি কমলাকে এতোটাই নিস্পৃহ করে তুলেছে যে স্বামী-সন্তানের গুরুত্বও তার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

'বিন্দুবাসিনী' গল্পটিও স্বামীর আর্থিক কৃচ্ছতার দরুণ স্ত্রীর জীবনের নানামাত্রিক জটিলতার চিত্রকে ধারণ করে রচিত। এখানে সুষমার মানসিক অশান্তির পেছনে স্বামীর পাশাপাশি শাশুড়ির ভূমিকাও প্রকট ছিল। লেখাপড়া জানা সুষমা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু শাশুড়ি বিন্দুবাসিনী চেয়েছে তাকে নিয়মের অধীনে বেঁধে রাখতে। পরিণামে সুষমা হয়ে ওঠেছে আরও বেপরোয়া। সংসারের কর্ত্রী হিসেবে বিন্দুবাসিনী তার পুত্রবধূর ওঠা-বসা, চলাফেরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। এদিকে সুধীন ছিল উপার্জনহীন, তাই সুষমার কিছুই করার ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত, আত্ম-সচেতন মেয়ে হিসেবে সুষমার পক্ষে শাশুড়ির অন্যায় কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই স্বামীর প্রতি হয়ে ওঠে সে নিরাবেগ ও কঠোর -

> "এক এক সময় বলেছে সুষমা স্বামীকে সে ভালোবাসে না। বিয়ে করা তার ভুল হয়েছে, ভুল বিয়ে হয়েছে, Ñঅবশ্য শাশুড়ির কাছে নয়; (সে সাহস সুষমার ছিল না) বাড়ীর অন্য কারু কাছেই নয়, স্বামীর কাছে শুধু। কোনো কোনো দিন অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে দিনের ভিতর অনেক বার সুধীনকে এই সব কথা ঘুরে ফিরে বলে গিয়েছে সুষমা।"[৭]

স্বামীর অবর্তমানে শ্বশুরবাড়ির শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে সে আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজে আজকের যুগেও নারীর পক্ষে সমাজ-সংসারকে এভাবে উপেক্ষা করার দৃষ্টান্ত বিরল। সেখানে জীবনানন্দের যুগে তো এরূপ নারী খুঁজে পাওয়া একেবারেই কঠিন ছিল। লেখক মূলত সুষমা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারীর প্রতিবাদী ভূমিকাকে মূর্ত করে তুলেছেন। পরবর্তী সময়ে সুষমা নিজে নির্ভার থেকে তার সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বও ইচ্ছাকৃতভাবে শাশুড়ির ওপর চাপিয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের বেকার ছেলের স্ত্রী হিসেবে যেকোনও বায়না যে তাকে মানায় না তা সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। স্বামীর সঙ্গে বাইরে গিয়ে বায়েস্কোপ দেখতে চাইলে স্বামী ও ও শাশুড়ির পক্ষ থেকে বাধা আসায় সে সবকিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বায়োস্কোপের প্রতি তার এই প্রবল আগ্রহ স্বামীর প্রতি প্রেমহীনতারই বহিঃপ্রকাশ, নইলে সে স্বামীর অসহায়ত্ব ঠিকই অনুধাবন করতে পারতো। পরিবারের সবার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার সাহস সুধীনের ছিল না, এটা সে বুঝতে চায় না। তবে তার এ আপাত নিষ্ঠুর আচরণের অন্তরালেও ছিল একটি কোমলমতি মন। গল্প-উপান্তে তার প্রকাশ ঘটে নিম্নরূপে-

> "বায়োস্কোপ যাবে বলে বিকেলের মুখোমুখিই খোকাকে বড় একটা কাশীর বাটিতে করে দুধ খাইয়ে দিয়েছিল সুষমা। যেন অনেক রাতে সুষমা ফিরে আসবার আগে দুধ খাওয়ার জন্য খোকা না কাঁদে আর।"[৮]

সুষমার মধ্যে যাবতীয় অমানবিকতার সংশ্লেষ দেখিয়েও গল্পকার শেষদিকে এসে তার ভেতরের বাৎসল্যবোধের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাঠিন্যের পাশাপাশি কোমলতার মিশ্রণ ঘটায় সে এখানে বাস্তবসম্মতরূপ লাভ করেছে।

আত্মসুখপ্রবণ, উপভোগপ্রিয় ও স্বার্থপর নারীচরিত্রের উপস্থিতি জীবনানন্দের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের চাহিদাই হল -

> "রুচিকর খাওয়া, তৃপ্তিকর ঘুম, শীতে উষ্ণতা, গরমে শীতলতার একান্ত শারীর উপভোগ্যতা।"[৯]

'বত্রিশ বছর পরে' গল্পের স্বর্ণের মধ্যে এরূপ স্বার্থান্ধ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই স্বর্ণের মনে। স্বামীর প্রতি কিংবা সন্তানের প্রতি কোনও মমতা অনুভব করে না সে। দীর্ঘদিন পর স্বামী বাড়ি আসলে তার আরাম আয়েশের দিকে সে মনোযোগ না দিয়ে দেড়বছর বয়সী শিশুকন্যার দেখাশোনার ভার চাপিয়ে দেয়। বাচ্চা জন্ম দেওয়ার অপরাধে অভয়কে সে নির্মমভাবে দোষারোপ করে -

> "কে কাকে সেধে বিয়ে করতে এসেছিল, বিয়ে না মরণ! বিয়ে করেই যদি মেয়ে হওয়া, ঘটা! এখন বলেন টুকুনকে আমি রাখতে পারব না।' [...] 'কেন কার এমন গরজ পড়েছে যে তোমার টুকুনকে রাখবে? মেয়ে তোমার না আর কার? জন্ম দিয়েছেন নিজে পালবার বেলা পাড়াপড়শি।"[১০]

একচেটিয়াভাবে অভয়কে দোষারোপ করে শান্ত হয় স্বর্ণ। অথচ কন্যাটি যে তার নিজেরও এ কথাটি সে একবারও ভেবে দেখে না। জীবনানন্দ দাশের গল্পের এরূপ ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র প্রসঙ্গে জানা যায় –

> "জীবনানন্দের গল্পে বিবাহনির্ভর যৌনতার কোনো রোম্যান্টিক, স্বস্তিকর কিংবা প্রাণাবেগী চিত্র নেই; বরং সন্তান জন্মদানে তারা নিরুৎসাহী ও সন্তান লালন-পালনে বিরক্ত।"[১১]

আলোচ্য গল্পে স্বর্ণ রীতিমতো একটি অত্যাচারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। স্বামীর অর্থনৈতিক দুর্বলতাই তাকে দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। অভয়ের প্রতি সীমাহীন দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে সে ব্যক্তিগত জীবনের অপ্রাপ্তি ভুলতে চায়। অনতিক্রমণীয় ধূসর, বিবর্ণ দারিদ্র্য তার মননে অবসাদ এনে দিয়েছে এবং আচরণের সংযম নষ্ট করেছে। দীর্ঘদিন পর দূর থেকে আসা স্বামীর প্রতি স্বর্ণ কোনও দায়িত্ব অনুভব করে না। যদিও আবহমান কাল ধরে নারীই তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য বদ্ধপরিকর থেকেছে কিন্তু জীবনানন্দের গল্পে তার ব্যতিক্রম পরিলেক্ষিত হয়। স্বর্ণ রাতের বেলায় স্বামীর কাছে ঘেঁষে শোয় তার হাত-পাখার বাতাসের লোভে, অন্য কোনও আকাক্সক্ষায় নয়। আবার মধ্যরাতে পাশের বাড়ি থেকে আসা লুচি-মাংস খাওয়ার লোভও সে উপেক্ষা করতে পারে না। স্বামীর নিকটবর্তী হয়ে রোমাঞ্চ অনুভবের চেয়ে জিহ্বর পরিতৃপ্তি সাধনই তার কাছে প্রগাঢ়তম দাবি হয়ে ওঠে। নায়ক অভয় এসব দেখে হাঁপিয়ে ওঠে তার বত্রিশ বছর আগের শৈশবটাকে পুনরায় ফিরে পেতে চেয়েছে।

'কুষ্ঠের স্ত্রী' গল্পে রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও মানসিকতার দিক থেকে স্বামী সুশোভনের চেয়ে স্ত্রী অতসী অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। পরিমার্জিত রুচির অধিকারী সুশোভন একটি সুন্দর মনের লাবণ্যময়ী স্ত্রী প্রত্যাশা করেছিল তার জীবনে। কিন্তু অতসীর কদর্য ও স্বার্থ-সচেতন মানসিকতা তাকে আহত করে। বিয়ের কেনাকাটায় কেন সুশোভনের পরিবারের সবাই অংশগ্রহণ করলো তা নিয়ে ঘোর আপত্তি জানায় অতসী। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তার হীন মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে -

> "এই রকম করে বুঝি তুমি টাকা নষ্ট কর। আমি আর এমন হতে দিচ্ছি না। অন্যের টাকা যে-যা খুশি করুক গিয়ে। কিন্তু তোমার টাকায় আমি কারু হাত দিতে দেব না।"[১২]

বিয়ের চন্দন ওঠে যাওয়ার পর সুশোভনের মুখের পোড়া দাগ উন্মোচিত হলে সেগুলোকে সে কুষ্ঠের ক্ষত ভেবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ঠকানো হয়েছে ধরে নিয়ে অর্থমূল্যে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার দাবি জানায়।

> "যখন আমার পরকাল নষ্ট করেছ, তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে লিখে দিতে হবে"[১৩]

অতসীর এই বক্তব্য তার অর্থলোভী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। স্বামীর মুখাবয়বের সৌন্দর্যহীনতার জন্য সে আক্ষেপ করে বটে, কিন্তু তার নিজের ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের পাটির জন্য চেহারায় যে কুশ্রীতা বিরাজমান তা সে ভেবে দেখে না। অতসীর এরূপ বাস্তবজ্ঞানবর্জিত আচরণ তার জটিল মানসিকতারই পরিচায়ক।

'সুখের শরীর' নামক গল্পে নিরুপমের স্ত্রী ইন্দিরা তার বিবাহিত জীবনের শুরুতেই নিজেকে একটি নিপীড়নকারী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে। স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির অন্য কোনও সদস্যের প্রতি তার কোনও মনোযোগ নেই। চারপাশের সবাই কি চাইছে এ ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে দিব্যি নিজের আরাম-আয়েশের উপায় খুঁজেছে। পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা স্বামী-স্ত্রীর মানবিক দায়িত্ববোধের অংশ। নিরুপম যদিও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু বিরূপতা এসেছে ইন্দিরার দিক থেকে। সে কেবল তার শরীরের শান্তি ও দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষার জন্য তৎপর থেকেছে। সেজন্য নারীত্বের মূলমন্ত্রকেও সে অস্বীকার করতে চায়।

> "মাতৃত্ব ছাড়া ভারতীয় নারীর জীবন কল্পনাই করা হয় না।"[১৪]

অথচ নিজে সে কখনোই মা হতে চায় না, একথাটিই সে সদম্ভে উচ্চারণ করে। মেজখুড়ির অধিক সন্তানলাভকে ব্যঙ্গ করে সে জানায় -

> "বাবা, একটি ছেলেপুলেরও প্রয়োজন নেই আমার। সত্তর বছরেও যুবতী মেয়েমানুষের মতো কেমন ফিট চেহারা থাকবে।"[১৫]

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা চরিত্রটি প্রথাগত ভারতীয় নারীর যে প্রচলিত ইমেজ তার বিপরীতধর্মী চিত্র নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

'বাসররাত' গল্পটিতেও স্ত্রীর প্রেমহীনতার কারণে স্বামীর মনোজগতে সৃষ্ট অবসাদের সকরুণ চিত্র রচিত হয়েছে। প্রেমনীহারের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক দুর্বল বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেই হাঁপিয়ে ওঠে মণিকা। বাসররাতে স্বামী তার প্রতি মমত্বপূর্ণ আচরণে বিরক্ত হয়ে সারারাত সে ঘরের বাইরে কাটিয়ে দেয়। কলকাতা শহরে প্রেমনীহারদের নিজস্ব বাড়ি নেই, ভাড়া বাসায় তাদেরকে থাকতে হয়Ñ সেজন্য তাকে সে কটাক্ষ করে। প্রতিবেশির সুবিশাল অট্টালিকা দেখে ওবাড়ির নববধূর সঙ্গে প্রতিতুলনায় নিজের ভাগ্যের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে মণিকা। শুধু অর্থনৈতিক কারণেই নয়, মানসিক বৈপরীত্যের কারণেও প্রেমনীহারের সঙ্গে সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। কেননা -

> "দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তই হল বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মতাদর্শগত মিল। যে দম্পতির জীবনে এইসব প্রাথমিক শর্তগুলো অনুপস্থিত সেখানে সম্পর্কের বোঝা টানা অর্থহীন, নীতিহীন এবং সুস্থ মানসিকতার পরিপন্থী।"[১৬]

এ গল্পে মণিকা তার স্বামীর কাছে চেয়েছে যৌবনের উন্মত্ততা ও চাঞ্চল্য। কিন্তু শিক্ষিত ও সংবেদনশীল চরিত্র হিসেবে প্রেমনীহারের মধ্যে তার অনুপস্থিতি ছিল। তাই প্রতিবেশির বাড়ির নববধূর মেজো ভাইয়ের দেওয়া শ্বেতপদ্মের মধ্যে সে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিতে চায়।

'বাসরশয্যার পাশে' গল্পের নববধূ নীহার অনেক বেশি স্বার্থসচেতন ও মূল্যবোধ-বিবর্জিত একটি চরিত্র। শহুরে শিক্ষিত স্বামীর মার্জিত আচরণের বিপরীতে সে কদর্য ও হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বাসররাতে সে স্বামীকে উপেক্ষা করে পূর্বপ্রেমিক চারুর সাথে হাসি-তামাশা করে সময় কাটায়। চারুকে বিয়ে না করার পেছনেও তার স্বার্থান্ধতা ক্রিয়াশীল ছিল। এ ব্যাপারে সে নিজেই জানিয়েছে যে পাড়াগাঁয়ে থাকবে না বলে সে প্রেমিকের সঙ্গে বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। শহরে এসে সে শ্বশুরবাড়ির মানুষের প্রতি অকারণে অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও উন্নাসিকতা দেখিয়েছে। সন্ধ্যার পরে ¯œানের ঘরে জল না পেয়ে সে যেরূপ চেঁচামেচি করে তা একজন নববধূর পক্ষে যথেষ্ট বেমানান ছিল। নিজের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে স্বামীকে সে শুরুতেই জানিয়ে দেয় -

> "উনুনের ধোঁয়া আমার সহ্য হয় না আগের থেকে বলে রাখছি। আমার বড্ড কাঁচা শরীর। সুন্দরীদের যা হয় - কষ্ট করবার ধাত নেই। সবদিকই হবে কি করে? সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই - আবার রান্নাবাড়িও চাই - তা কি কখনো হয়!"[১৭]

শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে নীহার তার স্বামীর ওপর এতোটা অধিকার খাটায় ঠিকই, কিন্তু স্বামী তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে সে বিরূপ হয়ে ওঠে। দেবব্রতকে সে যেরূপ রূঢ়ভাবে উপেক্ষা করে তা তার জটিল ও বিকৃত মানসিকতা থেকে উৎসারিত।

'মেয়েমানুষ' গল্পে কলকাতা নগরীর উচ্চ-মধ্যবিত্ত দম্পতি হেমেন-চপলা ও দ্বিজেন-লীলার দাম্পত্য-সম্পর্ক চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে দুটি নারীর জটিল-জীবনের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। লীলা তার স্বামীর পরনারীপ্রীতি ও অনৈতিক আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে মানসিক সুস্থিরতা হারিয়েছে। স্বামীকে তাই সে তীর্যক বাক্যবাণে আহত করে এবং তার প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। দ্বিজেনের কপাল লক্ষ্য করে রুটিকাটা ছুরি ছুঁড়ে মারে। যদিও ছুরিটা ফসকে গিয়ে দেয়ালে লাগে, কিন্তু তা তার কপালে লাগলেও লীলার কোনও আক্ষেপ ছিল না। এ ব্যাপারে সে একেবারেই নির্বিকার -

> "ভোঁতা একটা রুটিকাটা ছুরি কপালে লাগলেও বা কী হত?"[১৮]

এরূপ মানসিকতার মধ্য দিয়ে স্বামীর প্রতি তার সীমাহীন বিরক্তির প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে চপলা মেয়েটি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, ধীরস্থির হলেও তার মধ্যে রহস্যময় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বাহ্যত সে শান্ত ও স্বামীর প্রতি সমর্পিত, কিন্তু গোপনে সে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে নিবিড় সময় অতিবাহিত করে। চপলার এরূপ আচরণের তথা আবেগীয় অস্থিরতার (emotional instability) উৎস নিহিত রয়েছে তার দ্বিখন্ডিত ব্যক্তিত্বের (spilt personality) মধ্যে। কেননা -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 117-124
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "A split personality refers to dissociative identity disorder (DID), a mental disorder where a person has two or more distinct personalities. The thoughts, actions and behaviors of each personality may be completely different."[১৯]

দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্বের কারণেই দ্বিজেনের সঙ্গ কিছুক্ষণ পরই আবার তার অপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বামী কখন ফিরে আসবে এই চিন্তাই তখন তার কাছে মুখ্য গুরুত্ব পায়।

যুগ-প্রভাবিত বিষণ্নতাও জীবনানন্দের গল্পের নারীচরিত্রের মনোলোকে অবসাদ সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। 'প্রণয় প্রেমের ভার' গল্পের হেমলতা চরিত্রটির মধ্যে তারই পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বিবাহিত জীবনের শুরুতেই তার ভেতর ক্লান্তি এসে ভর করে। দাম্পত্যকে সে আবেগময়তার সঙ্গে গ্রহণ না করে নিছক কর্তব্যকর্ম হিসেবে গণ্য করতে চায়। তাই স্বামীর সামান্যতম সাধ-আহ্লাদকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো মানসিকতাও তার মধ্যে দেখা যায় না। ত্রিশ বছর বয়সী সুবোধকে সে বৃদ্ধের কাতারে ফেলতে চায়, তাই তার যেকোনও চাহিদাকে সে বালখিল্য ভেবে তাচ্ছিল্য করে। হেমলতা তার যৌবনের শুরুতেই পরিণত-বয়স্কা নারীর মতো আচরণ করে। সতেরো বছর বয়সের এ নারী সুবোধের কাছে তাই প্রবীণা, দায়িত্ববোধসম্পন্না, কর্তব্যভারাক্রান্তা, বিরূপ, বিবসনয়না হিসেবে প্রতিভাত হয়। স্বামীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে হেমলতার ঘোর আপত্তি। সুবোধের কোমলতার বিনিময়ে সে তাকে ফিরিয়ে দেয় গভীর রুক্ষতা। জীবনানন্দের গল্পের অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রের মতো এ গল্পের সুবোধ কর্মহীন নয়, তবুও স্ত্রীর বিরূপ আচরণের হাত থেকে তার মুক্তি নেই। ছুটির দিনে কাজকর্ম শেষ করে স্বামীকে সময় দেওয়ার মতো আগ্রহ সৃষ্টি হয় না হেমলতার মনে। সংসারে সে গৃহস্থালীর কাজকে প্রাধান্য দিয়ে প্রেমকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করে। সুবোধের প্রতি তার মনোভাব নিম্নোরূপ -

> "স্বামীকে দু-চারদিন নেড়েচেড়েই হেমলতা বুঝেছে যে এ ঢের বিশ্বাসযোগ্য। বই, কাগজ, অফিস ও নিজের অবশ্য কর্তব্য নিয়েই সে থাকে; বিশেষ কোনো তরলতা ফাজলামি এ-মানুষটির ভিতর নেই। মাঝে-মাঝে একটা জানোয়ারের মত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে যেন কিন্তু সে খুব কচিৎ।"[২০]

জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে এতোটা চুলচেরা বিশ্লেষণ যার মনে ক্রিয়াশীল তার কাছ থেকে আবেগময়তা প্রত্যাশা করা যায় না। হেমলতা তার স্বভাবজাত নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্য দিয়ে সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত নিরস করে তুলেছে। স্বামীর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখার ব্যাপারে তার চেষ্টা অন্তহীন, কিন্তু তারও যে অবস্তুগত চাহিদা রয়েছে তা সে মানতে নারাজ। হেমলতার এই উচ্ছ্বাসহীনতা তার পিতৃ-পরিবারের অভাব-অনটন থেকে উৎসারিত। নিজে সে 'কষ্ট-সৃষ্টের' ঘর থেকে এসেছে বলে দাম্পত্য-জীবনে কোনও অপচয় বা বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। স্বামী তাকে বাইরে ঘুরতে নিয়ে যেতে চাইলে অর্থব্যায়ের কথা ভেবে সে রাজি হয় না। অপব্যায় কমানোর লক্ষ্যে সুবোধের প্রতিও সে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। সুবোধ তাকে খুশি করার জন্য সব বিলাসিতা ত্যাগ করলেও তার মন পায় না। কাজের লোক বিদেয় করে তার কাজ দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে করতে চায় হেমলতা। এ ব্যাপারে সুবোধ মনের দিক থেকে রাজি না থাকলেও সে তার সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। এরূপ অতিমাত্রায় হিসেব-নিকেশ, সারাক্ষণ সাংসারিক উন্নতির চিন্তা, স্বামীর প্রত্যাশার গুরুত্ব না দেওয়া প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়ে হেমলতা নিজের জীবনের শান্তি-আনন্দ লাভের পথকে নিজেই রুদ্ধ করেছে।

নারীর অন্তর্লোকের জটিলরূপের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। হৃদয়ের বক্রতার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা নারীর জীবনকে আরও বেশি জটিল করে তুলেছে। তাঁর গল্পে নারীকে কখনও কলহপ্রিয়, নিষ্ঠুর চরিত্র হিসেবে পাওয়া যায়, আবার কখনও সে সমাজের যাঁতাকলে পিস্ট হয়ে নিরানন্দ জীবন অতিবাহিত করে। সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া নারীর সংখ্যাও দুর্লক্ষ্য নয় জীবনানন্দের গল্পে। নারীর জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা অপূর্ব শিল্প-সুষমায় অভিব্যক্ত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের গল্পে।

Reference :

১. মুহাম্মদ, আনু, নারী, পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 117-124
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড-গল্প, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯৭

৩. Mitchel, D.G., *A Dictionary of Sociology*, Routeledge & Kegan-paul, London, 1968, p.4

৪. দাশ, জীবনানন্দ, তদেব, পৃ. ১৯২

৫. তদেব, পৃ. ১৯২

৬. তদেব, পৃ. ১৯৫

৭. তদেব, পৃ. ৮৬০

৮. তদেব, পৃ. ৮৭০

৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৫

১০. দাশ, জীবনানন্দ, তদেব, পৃ. ১৯৫

১১. সালেকীন, সিরাজ, 'জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে নারী : বাস্তব ও বোধ', জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার, সিরাজ সালেকীন (সম্পা.), ২০১৬, পৃ. ৪৩৬

১২. দাশ, জীবনানন্দ, তদেব, পৃ. ২৩০

১৩. তদেব, পৃ. ২৩২

১৪. মাসুদুজ্জামান, 'সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর', মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭, পৃ. ৪৩

১৫. দাশ, জীবনানন্দ, তদেব, পৃ. ২৪০

১৬. ঘোষ, প্রবীর, 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২২১

১৭. দাশ, জীবনানন্দ, তদেব, পৃ. ২২৫

১৮. তদেব, পৃ. ২৯৭

১৯. W. Putnam, Frank (1993), *Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder*, American Psychiatric Publishishing, Washington D.C., 1993, p. 110

২০. দাশ, জীবনানন্দ, তদেব, পৃ. ২৯৭